ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 693-699
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.058

রাভা জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং 'সোঁদাল' ও 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তব চিত্র

ধনেশ্বর বর্মন, *স্বাধীন গবেষক, বালাসুন্দর, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although the Rabha community is an indigenous tribe of Assam, a section of them migrated to the vast plains of North Bengal due to livelihood needs. There are significant differences between the Rabha tribe of Assam and the Rabha community residing in three districts of North Bengal (Jalpaiguri, Alipurduar, and Cooch Behar). This distinction becomes evident when one examines their dwellings, houses, furniture, attire, ornaments, food, and language. The geographical environment of North Bengal has influenced the lifestyle of the Rabha community living in these regions. Amiya Bhushan Majumdar (1918–2001) was an exceptional author in Bengali literature. He spent his childhood, grew up, and spent his entire professional life in the town of Cooch Behar. Living in the Cooch Behar district for an extended period allowed him the unique opportunity to closely observe the tribal societies of North Bengal. In his novels Sondal (1987) and Bindani (1985), he depicted the society and culture of the Rabha community. Drawing from his close observations, he portrayed the origin, language, culture, traditions, and social systems of the Rabhas through the characters in his novels. Amiya Bhushan was familiar with the languages of the indigenous communities of North Bengal. By examining the social condition of the Rabhas, he highlighted how they have gradually been marginalized over time. His novels encapsulate the conflicts and integration of the Rabhas with modern civilized society. The first phase of modernization for the Rabhas was marked by their religious conversion. Through his writings, he attempted to show how the Rabha community of North Bengal is one of the most affected groups. Over time, they have lost their settlements, culture, language, identity, and even the structure of human relationships. The author directly experienced and observed all these aspects of the Rabha community and expressed these observations in his novels.

Keywords: Rabha, community, Assam, North Bengal, lifestyle, modernization, religious conversion.

ভারতের অন্যান্য উপজাতির মতই রাভা জনগোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানে 'জনজাতি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা প্রধানত আসামের কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, কামরূপ, শোণিতপুর, দরং, ধুবড়ী, মেঘালয়ের পশ্চিম গারো-পাহাড় জেলা, পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বাস করে। রাভাদের উৎপত্তি বসতি ও জাতিগত পরিচয় নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট উপজাতি রাভা। এই জনজাতি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বুকালন হ্যামিলটনের রচনায় ১৮১০ সালে।

বি.এইচ. হডসন ১৮৮০ সালে মন্তব্য করেন যে, রাভা বোড়ো জাতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে রাভারা ইন্দো-মঙ্গোলীয় কোচগোষ্ঠীর অন্তর্গত। *অন্তেবাসীসমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন* প্রবন্ধগ্রন্থে রূপকুমার বর্মন মন্তব্য করেন–"রাভারা মূলত কোচ ভাষা ও বোডো সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী, জাতি-সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য (Racio-Cultural Contradicition) সংবিধান অনুযায়ী খানিকটা দূরীভূত হয়ে রাভাদের তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) এর মর্যাদা দান করলেও জাতি না সংস্কৃতি এই জনগোষ্ঠীর পরিচিতির মানদণ্ড হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের কোনো সঠিক সমাধান হয়নি।"[১] তবে একসময় রাভা জনগোষ্ঠীকে 'অনির্দিষ্ট' জাতির তকমা বহন করতে হত। রাভা সমাজের প্রচলিত মতানুসারে ঈশ্বর সৃষ্ট এক দম্পতি থেকে বিভিন্ন কন্যার জন্ম হয় তাদের থেকে পরবর্তীতে রাভাদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে। অতীতে রাভারা কোচ নামেই পরিচিত ছিলেন। কোচ রাভাদের পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হত, (রংদানিয়া, পাতি, দুহড়ী ,মায়তোরী, কোচ)। সুনীল পাল তার *রাভা লোকমানস* গ্রন্থে বলেছেন –"কোচদের লোকগাথানুসারে দেখা যায় কোচ, মেচ, লেপচা, ওরাই এরা হলেন চার ভাই যারা স্বর্গ (রাংকারাং) থেকে পৃথিবীতে (হাসং) এসেছিলেন দেবতা ঋষিবাই (রাভাদের প্রধান দেবতা) এর নির্দেশে।"[২]

কোচ রাভারা বৃহত্তম বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে অনেকে মনে করেন। কোচ নামটি এই জাতির অতিপ্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ নাম। কিন্তু কালক্রমে রাভা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়। ফ্রেণ্ডপেরেরাও একটি গল্পের নির্দেশ করে বলেছেন, প্রথমে দিকে রাভারা গারো পাহাড়ে বসবাস শুরু করে কিন্তু সেখানে গারোদের সঙ্গে অবিরত লড়াই শুরু হয় ফলে তারা সমতল ভূমির দিকে (গোয়ালপাড়া) নেমে আসে। সমভূমির দিকে বিশেষত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নামতে থাকে। *উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার* গ্রন্থে ধনেশ্বর বর্মন বলেছেন উত্তরবঙ্গে রাভারা কবে এসেছিল সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সম্ভবত যিশুখ্রিস্টের জন্মের দু-হাজার বছর আগে মহাচীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর অববাহিকা থেকে পশ্চিম দিকে এক দল লোক যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে এই দলের লোকেরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি দল তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ হয়ে ভারতের মিজোরাম, মণিপুরে, অসম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, এসে বসবাস শুরু করার চেষ্টা করে। অন্য দলটি আর একটু পশ্চিমের দিকে গিয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার অববাহিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তরাই ও ডুয়ার্স এলাকায় বসবাস শুরু করার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলগুলিতে যারা বসবাস শুরু করতে থাকে তারাই রাভা বলে পরিচিতি লাভ করে। বাসস্থান অনুসারে রাভা জনজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হত, বনাঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাভাবস্তি এবং জাতি হিন্দু অধ্যুষিত রাভাদের গ্রাম। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে রণজিৎ দেব মন্তব্য করেন–"কোচবিহার

ও জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলে কোচ রাভার জনসংখ্যা ছয় হাজারের বেশি। কোচবিহার জেলার ভারেয়া, বড় শালবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য, দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি, হেমাগুড়ি-পূর্ব শালবাড়ি, নারারখালি রাধানগর, কালচিনি থানার নিমতি, মেন্দাবাড়ি, মাদারিহাট, রায়ডাক-ইন্দুবস্তির বনাঞ্চলে রাভা জনজাতির বাস।"[৩]

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত প্রথানুগ জীবনযাত্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাভা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজের নানান বিচিত্র পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকধর্ম, লোকনৃত্য প্রবাহমান কাল ধরে মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই চলে আসছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজ জীবনের কাছে তা গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে দেখা দিয়েছে মানুষের সময়ের সাথে দিনবদলের দিন যাপনের পালা। সময়ের আধুনিকতায় পুরাতন নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস, রাভা সমাজের মন থেকে অনেকটাই মুছে গেছে। সোঁদাল (১৯৮৭) উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে প্রতিক্ষণ পত্রিকায়। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয় (শারদীয়া) ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। উপন্যাসটিতে লেখক রাভা সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি রাভা সম্প্রদায়ের জনজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। মরুচমতী নদী, তুরুককাটা শহর, ডাউকিমারি ব্লক, হাতকাটা, হাদলমারি, লাউতামা এই নামগুলি বার বার এসেছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর সোঁদাল: ভঙ্গুর সত্তার আখ্যান প্রবন্ধে বলেছেন – "'সোঁদাল'কে ভাবা যেতে পারে অমিয়ভূষণের মাতৃভূমি আবিষ্কারের গল্পহীন গল্প। শুরু থেকেই প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ভাবে সভ্যতার যে সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তিনি, তার তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতেই হয়। সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে, আপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রতিনিয়ত যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকে, তাদের আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু সে অভিধার যোগ্যমান্যতা দেওয়া হয়না কখনোই। এই জন্যে পর্বে-পর্বান্তরে তারা ভারত নামক দেশের মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে। তাদের কোনো মৌলিক অধিকারই স্বীকৃত হয়না; বরং কালস্রোতে ভেসে যায় সবকিছু।"[৪] সোঁদাল উপন্যাসের কাহিনি মূলত আবর্তিত হয়েছে মোন্নাতকে কেন্দ্র করে। মূল কাহিনি হিসেবে উঠে এসেছে কৈচন্দ্র এবং তিন্নির কাহিনি। নায়ক মোন্নাতের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে দিয়ে তিনি রাভা জনজাতির বিভিন্ন সমস্যার কথা আমাদের বলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ ব্যবস্থায় জমির সাথে নারীর সম্পর্ক এবং অরণ্যের সঙ্গে তাদের যে একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে কিভাবে জমির মালিকানা থেকে নারীর প্রাধান্য কমে গেল এবিষয়ে তিনি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন রাভা গ্রামগুলির বেশির ভাগেই গড়ে উঠেছিল অরণ্যকে কেন্দ্র করে। তিনি লক্ষ করেছিলেন অরণ্যের বিলুপ্তি ফলে রাভা জনজাতির মানুষের জীবনে কি পরিমাণে সংকট নেমে এসেছিল এবং যে রাভা সমাজে একসময় অরণ্যই ছিল সমাজ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, সেই রাভা সমাজ কিভাবে অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই প্রশ্নগুলি তিনি উপন্যাসে তুলেছেন। রাভা গ্রাম আর অরণ্যকে নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের চরিত্র গুলির মধ্যে দিয়ে লেখক অরন্যের সঙ্গে রাভা সমাজের যে সম্পর্ক ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

উপন্যাসে দেখি তিন্নি এক বন থেকে উৎখাত হয়ে অন্য বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা অরণ্যকে রাভা সমাজের মানুষেরা অস্বীকার করতে পারেনি। বারবার তারা অরণ্যের অধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টাকরেছেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মোন্নাতের মুখ থেকে শুনতে পাই –"বনকে রক্ষা করলে বন তোমাকে রক্ষা করে।"[৫] রাভাদের ধান খেতের পাশেই থাকত বন তাই খুব সহজেই রাভা জনজাতির মানুষের সাথে বনের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু রাভা নয়, কোচ রাজবংশীদের সঙ্গেও লেখক বনের একটা সুসম্বন্ধ দেখিয়েছেন। রাভা বসতি গ্রাম গুলি অরণ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এই অরণ্যগুলি রাভা জনজাতির মানুষদের কিভাবে রক্ষা করে ছিল লেখক মোন্নাতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। রাভা সমাজে নারীর সঙ্গে জমির একটা আত্মিক যোগ রয়েছে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটিতে আমরা দেখি পঙ্কিনী রাভার একই মাসে স্বামী ও মেয়ের মৃত্যু হয়। স্বামী, মেয়ে মারা যাওয়ার পর পঙ্কিনী কীভাবে তার জমি রক্ষা করবে সে বুঝে উঠতে পারেনা। তাই তিনি বাধ্য হয়েই জমি রক্ষার জন্য সংকটময় মুহূর্তে অল্প বয়সী জামাইকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। রাভা পুরুষের কাছে যেন নারীই সব। নারী হারালে তাদের জমি অধিকারে টান পড়ে। রাভা পুরুষেরা যেন রাভা নারীর শরীরের শান্তি খুঁজে পায় জমির মধ্যে দিয়ে। রাভা নারীর জমিতে পুরুষের কৃষিকাজ করার পর শিকার ছাড়া আর তেমন কোনো কাজই থাকে না। কৃষিজমির ফসলকে হাতির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাভা পুরুষের। সোঁদাল উপন্যাসে লেখক এপ্রসঙ্গে বলেছেন–"কী করবে, কেন, তোমরা রাভার বেটা? রাভার বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল্। হাঁতি আইসে, রুখিবে? ভৈষী ঢোকে ধানখেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনা শুয়োর আইসে ধানবাড়ি? বন কোটে?"[৬] কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাভা সমাজেও জমি হস্তান্তরিত হতে দেখা যায়। জমির মালিকানা পুরুষের হাতে চলে যায়। লেখক এই পরিবর্তন টাই দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের আরেক চরিত্র মলগুঁর মধ্যে দিয়েও লেখক তাদের সমাজের বদল দেখিয়েছেন। মলগুঁর কথা থেকেই আমরা জানতে পারি তার শাশুড়ি তাকে তার স্ত্রীর গ্রামে নিয়ে আসে। সমাজ সচেতন মলগুঁ সে তার জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। রাভা থেকে যারা পদবী পরিবর্তন করে দাস বা বৈষ্ণব পদবী গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। মলগুঁ জানায় বৈষ্ণব হওয়ায় কিছু অসুবিধা আছে। রাইন্তুক পূজা লক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়। সেখানে চকোৎ এবং শূকরের মাংস দেওয়া যায় না। কিন্তু রাভা সমাজে যেখানে রাইন্তুক পূজায় চকোৎ এবং শূকরের মাংস দেওয়া ছিল আবশ্যক। পদবী পরিবর্তন হওয়ায় এই সমস্যা ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়। মোন্নাত যখন মলগুঁর কাছে জানতে চায় যে তোমার গোত্র কার? তখন সে জানায় সে মায়ের গোত্র পেয়েছে। তার ছেলে মেয়েরা তারা তাদের মায়ের গোত্র পাবে। রাভা সমাজে একসময় গোত্র নির্ধারিত হত মায়ের দিক থেকেই মলগুঁর সংলাপ দিয়ে লেখক স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। রাভাদের আত্মার সদ্গতি সংক্রান্ত 'চিকাবাইরাই' নামক প্রথার কথা আমরা সোঁদাল উপন্যাসে ও মোন্নাতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি। সব রাভাই জানে তার চিকাবাইরাই আছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে রাভা সমাজের মানুষেরা জানতে পারে তার চিকাবাইরাই' কোথায় আছে।

আর এই চিকাবাইরাই এর কথা রাভা জননীই একমাত্র জেনে থাকে। সারা জীবন রাভা জননী মনের গোপনে চিকাবাইরাই কথা লুকিয়ে রাখে। জননীর মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে সে মাতৃ সম অন্য কোনো রমণীকে বা তার স্ত্রীকে গোপনে চিকাবাইরাই নামক প্রথার কথা বলে যান। রাভা সমাজের মানুষেরা চিকাবাইরাই নামক প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিল মলগুঁর সংলাপ থেকেই তা আমরা জানতে পারি –"কোন

রাভার চিকাবায়রাই নাই থাকে কেমন রাভা সে?"[৭] অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করায় উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং রাভা জনজাতির দৈনন্দিন জীবনের সাথে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। একারণেই হয়তো তিনি জানতে পেরেছেন তাদের চিকাবাইরাই নামক প্রথার কথা। কিন্তু বর্তমান রাভা সমাজে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির মানুষেরা সবদিক দিয়েই যে একটা অস্তিত্বের সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়ে এই উপন্যাসে স্পষ্ট ভাবে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর সোঁদাল: ভঙ্গুর সত্তার আখ্যান প্রবন্ধে বলেছেন –"আগ্রাসী পুঁজিবাদ যখন প্রযুক্তির নখর প্রহারে আরণ্যক সভ্যতাকে ফালাফালা করতে চাইছে, মাতৃতান্ত্রিক রাভাগোষ্ঠীর মানুষ যে প্রতিকারহীন বিপন্নতার মুখোমুখি- সেই উপলব্ধিকে অমিয়ভূষণ আখ্যানে রূপান্তরিত করেছেন। নৃতাত্ত্বিক নিরিখে যে সব জনগোষ্ঠী 'অতিআপতগ্রস্ত' বলে অভিহিত হচ্ছে। তাদের অন্যতম 'সোঁদাল' এর গণমানুষ।"[৮]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিনদনি (১৯৮৫) উপন্যাসটি ১৩৯২ বঙ্গাব্দে সপ্তাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়েও তিনি রাভা জনজাতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই উপন্যাসের তিনি রাভা সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে তাদের সংকটের কথা বলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন রাভারা কোথা থেকে এলো? তাদের পরিচয় কি? এবং পরবর্তীতে তারা কোথায় গেল? এসব প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে লেখক তাদের অস্তিত্বের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শুরুতে –'গুড়িটা গাছের গোড়া নয়, নাকি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, ঠিক কি মানে ছিল তা ধরা যাচ্ছে না, তবে গুড়ি যুক্ত গ্রামের নামগুলো নাকি প্রমাণ করেছে, এদিকে বোড়ো জাতের মানুষেরা ছিল। এমনকি এখন যাকে ভোটান বলা হয় সেখানেও বোড়োরা রাজত্ব করেছে। এসব নিয়ে বেশি দূর যাওয়া ভালো হয়না। অহোম-আসাম নিয়ে গোল মাল আছে। এরকম মত আছে, যারা নিজেদের অহোম বলছে, তারা ব্রহ্মপুত্রের দুপারে বড় বড় ঘাসের পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই, আরও একদল মানুষ সে সব জায়গাকে আসাম, হা-সাম বলত। তাদের ভাষায় হা-সাম মানে পৃথিবী, মাটি, ভূমি-তৃণ, তৃণাচ্ছন্ন', এক কোথায় সবুজ তৃণাচ্ছন্ন পৃথিবী। যাক সে কথা, কোথায় গেলো তারা? রাভা নাকি তারা?"[৯] এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটকে তিনি ঘনীভূত করে তুলেছেন। তাদের সমাজ-সংস্কৃতি সময়ের কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা তিনি দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। লুপ্তপ্রায় জনজাতির মানুষদের কথা আলোচ্য উপন্যাসের তুলে ধরেছেন লেখক। অমিয়ভূষণ *বিনদনি* উপন্যাসে বুদিনাথ দাসের সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন রাভা কোচরা-কীভাবে হিন্দুর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

বুদিনাথ রাভা জনজাতি সর্ম্পকে জানায়- তারা 'নাং কোচা। আমরা কোচ' তারা রাভা এবং কোচ দুটোই। উত্তরবঙ্গে বহুদিন ধরে কোচ রাজারা রাজত্ব করেছিল। তারাই রাভা-কোচদের সর্বনাশ করেছে। বুদিনাথের সংলাপের মধ্যে দিয়ে লেখক এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রয়োজনে উপজাতিদের ব্যবহার করেছে, উপন্যাসে লেখক তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন- "তুই জানিস? উম্রা নাকি কয় রিস্টোবেঙ্গল এলা দশ হাজার আর হামরা পাঁচ হাজার। গাদলু একটু ভেবে নিল। বলল কথাটা মিথ্যা নয়। ও তো বলে, এখন প্রধানরা যে মাটি কাটায় কাজ করায়, তাতেও ওদের সংখ্যা বেশি বেশি, খেতমজুরের বেলাতেও তাই। সংখ্যায় ওরা আরও বেড়ে যেতে পারে। খোঁজ করলে দেখবি, রাভাদের জমিতে ওরা অনেকে আধিয়ার হয়ে গিয়েছে। জনাদল বলল, বমভোলা

কয়, মন্ত্রী নাকি বলছে ইম্রা আত্মীয়। আই সবেই এটে। যারা দ্যাশ ভাগ করছে উম্রায় দায়ী। ইম্রায় চিরদিন আত্মীয় থাকিবে।"[১০] অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর বিনদনি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির বাড়িঘরের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উপন্যাস থেকে আমরা জানতে পারি রাভা সমাজের মানুষেরা নিজেদের থাকার ঘর নিজেরাই তৈরী করত। বাড়ি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তারা বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করত। প্রতিটি রাভা পরিবারে কাঠ দিয়ে তৈরি একটি বড়ো ঘর থাকত। এই বড়ো ঘরকে তারা চার-পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিত নিজেদের প্রয়োজনে। যেসব রাভা পরিবারে আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল তারা পাটাতন করা দুটি ঘর বানাত। তাদের ভাষায় সেই ঘরকে বলা হয় নক্সা নগৌ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের বাড়ি ঘরের অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিনদনি উপন্যাসে লেখক রাভা সমাজের পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন। রাভা সমাজের মানুষেরা ছিল নৃত্যগীত প্রিয়। সারা বছরই তাদের বিভিন্ন উৎসব লেগে থাকত। আর এই উৎসবের জন্য প্রয়োজন হত বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের। তাঁত শিল্পের কাজ ছিল রাভা নারীদের জানা তাই তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক নারীরা নিজেরাই তৈরি করত। বিনদনি উপন্যাসে লেখক নিম্নরূপ পোশাক পরিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়েছেন –"হতে পারে, কেউ একদিন ফ্রক ছেড়ে আসামের দোখনার মত লাইফুন পরেছিল যা পায়ের পাতা ছুঁয়ে যায়, হতে পারে তাঁর বুক ঢাকার কামুং মেখলার মত পরা ছিল। সে সব প্রমাণ করে, সে সবই মাপে বড় হচ্ছিল সেই হাল্কা বারো-তের বছরের সবুজ সবুজ গায়ে। বিন্দে, তোর সাত নহর- লবগ আর আধুলি গাঁথা মালা তোর একমুঠো কোমরে আর কুল-বড়োই সমান বুকে বড় হচ্ছিল।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১. বসু, আশিসকুমার, ও চ্যাটার্জী, দেবী (সম্পাদিত) 'অন্তেবাসী সমাজ', সংস্কৃতি ও উন্নয়ন, হাওড়া: ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইণ্ডিয়া, ২০০৪, পৃ. ১৭৯।
২. পাল, সুনীল, (সম্পাদিত), 'রাভা লোকমানস', জলপাইগুড়ি: কিরাতভূমি, ২০০১, পৃ. ৬৯।
৩. দেব, রণজিৎ, 'উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত' মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৮।
৪. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত), 'অমিয়ভূষণ মজুমদার', বিশেষ সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৯৬।
৫. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' অষ্টমখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৩।
৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' অষ্টমখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮২।

৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' অষ্টমখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮১।
৮. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত), ;অমিয়ভূষণ মজুমদার' বিশেষ সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৮৯।
৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদিনি, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' সপ্তমখণ্ড, দে'জপাবলিশিং, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৮৫।
১০. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদিনি, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' সপ্তম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩২।
১১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৯)। বিনদিনি। অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৬-১০৭।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বর্মন, ধনেশ্বর, 'উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার', প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৭।
২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩।
৩. দে, সরকার, দিগ্বিজয়, 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি পরিচয়', ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০।
৪. দেব, রণজিৎ, 'উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত', মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪।
৫. বিশ্বাস, সুশান্ত, 'লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭।
৬. রাভা, রাজেন, রাভা জনজাতি, বীনা লাইব্রেরি, গুয়াহাটি, ১৯৭৪।
৭. সাহা, রেবতীমোহন, 'রাভাদের লোককাহিনী', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।
৮. ঘোষ, প্রদ্যোত, 'বাংলার জনজাতি', পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ২০০৭।